Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা-মুসিবতে ধৈর্য ধারন করার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লাভলী সুলতানা

রোলঃ 21500481216

১ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা-মুসিবতে ধৈর্য ধারন করার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লাভলী সুলতানা

রোলঃ 21500481216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা-মুসিবতে ধৈর্য ধারন করার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লাভলী সুলতানা, আইডিঃ 21500481216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা-মুসিবতে ধৈর্য ধারন করার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

লাভলী সুলতানা

আইডিঃ 21500481216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা: 5
ধৈর্য বা সবরের অর্থ: 6
ধৈর্য বা সবরের প্রকারভেদ : 6
ধৈর্য বা সবরের গুরত্ব ও ফজিলত : 9
ধৈর্য বা সবরের পুরস্কার : 15
নবী-রাসুলদের ধৈর্যের পরীক্ষা: 18
মহানবী (স:) এর ধৈর্যশীলতা : 21
নামাজে বাঁধা ও নবীজির সবর: 22
কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির ধৈর্য: 23
বিপদাপদে ও অনাহারে সবর: 23
পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ: 24
ধৈর্য ধারনের উপায়: 26
যেভাবে ধৈর্যের চর্চা করব: 26
সবর লাভের দোয়া: 29
আরেকটি সুন্দর দোয়া: 29
রাগ নিয়ন্ত্রণ : 29
রাগ নিয়ন্ত্রণের ইসলামিক পদ্ধতি : 30
জান্নাতি সুখানুভূতি: 33

ভুমিকা:

বড় কিছু অর্জন করতে গেলে বড় কিছু বিসর্জন দিতে হয়। বড় কোনো পুরস্কার পেতে গেলে বড় ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। জান্নাতের মহাপুরস্কার লাভ করতে গেলে দুনিয়ায় বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাই বহু ঈমানদারের জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ লেগে থাকে। বিপদের সময় সালাফদের ঈমান বেড়ে যেত, অথচ আমাদের ঈমান তখন নিভু নিভু হয়ে যায়। অনেকে তো সামান্য বিপদে পড়েই দ্বীন পালনে বিতৃষ্ণ হয়ে যান,আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল হারিয়ে ফেলেন, তাকদীরে বিশ্বাসের ভীত হয়ে পড়ে নড়বড়ে। অথচ আমাদের একটু সতর্কতা বিপদরূপী সেই ঘন কালো মেঘকে রহমতের বারিধারায় পরিনত করতে পারে। একটুখানি ধৈর্য বা সবরের মাধ্যমে সকল পাপ মোচন করে দয়াময় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। অন্যদিকে আমাদের সামান্য অসতর্কতার দরুন সেই বিপদ কালবৈশাখীর রুপ ধারন করে,ধ্বংস করে দিতে পারে আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত। তাই বিপদ আসলে হতাশ হওয়া যাবে না, কারন প্রত্যেকটি বিপদই তো পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহ কোন ব্যাপারে ফায়সালা করে ফেললে তা কেউই বদলাতে পারবে না। বান্দার যা পাওয়ার ছিলো তা কখনো তাকে ছেড়ে যাবে না। আর যে জিনিস তাকে ছেড়ে যাবে, তা আসলে কখনো তার পাওয়ারই কথা ছিলো না। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে, তার নিকট হতে উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশায় আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

ধৈর্য বা সবরের অর্থ:

সবর আরবী শব্দ।

এর আভিধানিক অর্থ হল ধৈর্য, দৃঢ়তা, সংযম ও নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। আর পারিভাষিক অর্থ হলো বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, অসুস্থতা প্রভৃতি সংকটময় মুহূর্তে বিচলিত এবং অস্থির না হয়ে বিপদ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনা করা। কেউ কেউ সবরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ‘সবরের প্রকৃত অর্থ হলো আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থার মোকাবিলা করা। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সবর নামক গুণটির উপস্থিতি অপরিহার্য।

ধৈর্য বা সবরের প্রকারভেদ :

ধৈর্য বা সবর প্রধানত তিন প্রকার।

১.নফসকে ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা।

ইবাদত যথা নিয়ম পালন করার অভ্যাস করতে হবে। মানুষের আত্মা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত রুটিন মাফিক করতে চায় না। শীতকালে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে অজু করার কষ্ট, ভোরে সুখের নিদ্রা ত্যাগ করে নামাযের জন্য জাগ্রত হওয়ার কষ্ট এবং দুনিয়ার কাজকর্মে নিমগ্ন থাকা অবস্থায় আযানের শব্দ শুনে মসজিদে যাওয়ার কষ্ট বরণ করে নেয়া একজন মানুষের পক্ষে বেশ কঠিন কাজ। আর এ সমস্ত ব্যাপারে নিজের নফসকে প্রশ্রয় না দিয়ে নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য তাকে বাধ্য করা হল সবরের প্রথম পর্যায়ের কাজ। আল্লাহপাক মানুষকে সৃষ্টি করে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ নির্দেশ অমান্য করে সে নিজের খেয়াল অনুযায়ী জীবন ধারণ করবে এটা হতে পারে না। মানুষের প্রতিটি কাজই স্রষ্টার নির্দেশিত পন্থায় সম্পন্ন করতে হবে। শুধু কোন কোন ব্যাপারে আনুগত্য করলেই চলবে না। নামায পড়া, রোযা

রাখা, হজ্জ, যাকাত সবই আনুগত্য। তেমিন শিরক, বিদআত দূরীভূত করার জন্য এবং কুরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করাও অন্যতম ইবাদত। বলাবাহুল্য সকল ইবাদতের মধ্যে এই জিহাদ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কেননা জিহাদ ব্যতিরেকে দ্বীন বা রাষ্ট্র কখনো টিকতে পারে না। আর দ্বীন যদি রক্ষা না হয় তাহলে অন্য ইবাদতের সুযোগ কোথায়?অতএব সকল আলস্য পরিহার করে ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং স্রষ্টার সফল বান্দা হিসেবে তৈরী হয়ে নিজে কল্যাণ লাভ করা এবং অন্যকে আনুগত্যের প্রতি আকর্ষণ করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো হলো সবরের প্রথম ধাপ।

২.নফস বা প্রবৃত্তিকে হারাম ও নাজায়েয বিষয়াদি হতে বিরত রাখা।

হারাম বা নিষিদ্ধ এবং অবাঞ্ছিত কাজের প্রতি নফসের বেশি আকর্ষণ থাকে। পরনারীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকানো, তাদের সাথে অবাধে মেলামেশা করা, তাদের সাথে ক্লাবে, পার্টিতে কিংবা পার্কে আড্ডা দেয়া ইত্যাদি অশ্লীল কর্মের প্রতি নফসের ঝোক বেশি থাকে। তাই নফসকে দমন এবং নিয়ন্ত্রণ করে এ ধরনের অশ্লীল, সমাজবিবর্জিত, নিন্দাজনক ও অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকাই হলো সবচেয়ে বড় ধৈর্যের পরিচায়ক। এই প্রকারের ধৈর্য আয়ত্ব করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ জন্যে নফসের সাথে অবিরত সংগ্রাম করতে হয়। এটা একটা বড় রকমের জিহাদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।’সম্মুখে শত্রুর বিরুদ্ধে

জিহাদ করার চেয়ে নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা জিহাদ করা অনেক কঠিন কাজ। শরীয়তের প্রতিটি হুকুম সঠিকভাবে মেনে চলার ক্ষেত্রে অনেক বাধা-বিপত্তি আসে। সে সব ক্ষেত্রে নফসকে নিয়ন্ত্রণ পূর্বক সকল লোভ লালসা ত্যাগ করে জীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে চালানো আসলেই বেশ শক্ত কাজ। বর্তমান যুগে এই প্রকার সবরের প্রয়োজনীয়তা কত যে বেশি তা সহজেই অনুমেয়। নফসের আকাংক্ষা পূরণকারী জিনিসগুলো আজ অতি সহজলভ্য। পথে বের হলে অশ্লীল পোশাক পরিহিতা নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত সহজলভ্য। টিভি পর্দায় নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারীর ছবি, ব্যবসায়িক লেনদেন করতে গেলে সুদ দেয়া-নেয়ার ফাঁদে পতিত হওয়া, অফিসে সাধারণ কাজ করতে গেলে ঘুষ দেয়া-নেয়ার প্রবণতা ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়ত। তাই এই ফিতনাময় সমাজে ঈমান রক্ষার তাগিদে মুমিনের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো হারাম ও নাজায়েজ বিষয়গুলো থেকে বিরত রাখা।

৩.ধৈর্য বা সবরের তিন নম্বর শাখা হলো যে কোন বিপদে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহর নিকট এই সবরের জন্য অনেক বড় পুরস্কার রয়েছে। কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে,“তোমাদেরকে আমি ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আর তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে। যখন তারা বিপদে পতিত হয়,তখন বলে,নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই কাছে ফিরে যাবো।তারা সে সমস্ত লোক যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” (সূরা বাকারা,আয়াত:১৫৫-১৫৭)। এর মানে হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে কখনো দুরবস্থার মধ্যে ফেলে পরীক্ষা করবেন আবার কখনো স্বচ্ছলতার মধ্যে রেখে পরীক্ষা করবেন।যাতে তিনি যাচাই করতে পারেন - কারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আর কারা অকৃতজ্ঞ হয়,কারা ধৈর্যধারন করে আর কারা অধৈর্য হয়।

ধৈর্য বা সবরের গুরত্ব ও ফজিলত :

সবরের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এত বেশি যে আল্লাহ পাক স্বীয় কালামে পাকে সত্তর বারেরও বেশি সবর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। মানুষের উন্নতি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় উপায় হলো সবর বা ধৈর্যধারণ করা। যে যত বেশি সবর করতে পেরেছে তার মর্যাদা তত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন "যখন তারা সবর করেছে, তখন আমি তাদের মধ্য হতে ইমাম বা নেতৃবৃন্দ সৃষ্টি করেছি, যারা আমার আদেশ অনুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করতো।" (সূরা সিজদা, আয়াত: ২৪)

সবরের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন, " নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা,আয়াত:১৫৩)
অনুরূপভাবে আল্লাহপাক আরো বলেন, নিশ্চয়ই সহনশীলদেরকে তাদের সবরের পুরস্কার হিসাব ছাড়াই প্রদান করা হবে।" (সূরা আযযুমার আয়াত:১০)

এইসব আয়াত হতে বোঝা যায় যে, ধৈর্য ব্যতীত অন্যান্য সৎকর্মের পুরস্কার হিসাব করে দেয়া হবে। রোযা ধৈর্যের অন্তর্গত বলে এ আমলের পুরস্কারও বিনা হিসাবেই দেয়া হবে। সবরের দ্বারা মানুষের ঈমান দৃঢ় হয়। কোন মুমিন তাই বিপদের সময় হতাশাগ্রস্ত হয় না। সে তো সর্বশক্তিমান, লা শরীক আল্লাহকে তার উপাস্য এবং পালনকর্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের মালিক বলে তাঁকে বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মৃত মানুষের উপর কোন বিপদ আসে না। বিপদ আসে জীবিত মানুষের উপর। একজন মানুষ যে জীবন্ত তার প্রমাণ হলো তার উপর বিপদ আসা। তাই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিপদে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করেছেন। কারণ, তারা তাদের প্রজ্ঞা, ইলম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা জেনেছেন, মানুষের উপর কম হোক বেশি হোক বিপদ আসবেই। কাজেই সেই বিপদে ধৈর্যহারা না হয়ে বরং হিম্মতের

সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করাই হলো উপযুক্ত ও যোগ্য বান্দার পরিচয়। নবীগণ হলেন সবচেয়ে উপরের স্তরের মানুষ। তাদের উপরই পরীক্ষা এসেছিল সবচেয়ে বেশি। আদম আ. থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীকেই এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। আদম আ. জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাননি, দোষ দেননি বরং নিজের ত্র"টির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি সবরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। হযরত নূহ আ. নিজ কওমকে সত্যের দিকে আহবান জানালে কওম কর্তৃক লাঞ্ছিত হন। তবুও তিনি ধৈর্যহারা হননি। অবশেষে তিনি ও তার অনুসারীরা কামিয়াব হয়েছিলেন। আর জালিমরা প্লাবনের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল। হযরত মুসা আ. এর সবরের পরীক্ষাও কম ছিল না। তিনি ফিরাউন কর্তৃক অত্যাচারিত হচ্ছিলেন। তৎসহ তাঁর নিজের কওম বনী ইসরাইলও তাঁকে কষ্ট দিয়েছে নানাভাবে। হযরত ইব্রাহীম আ. নমরুদ কর্তৃক অত্যাচারিত হন। হযরত ইয়াকুব, ইউসুফ, ইউনুস, যাকারিয়া এবং হযরত ইসহাক ও ইসমাইল আ. কেও অবতীর্ণ হতে হয় এই পরীক্ষায়। নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মক্কার কুরাইশগণ সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে। শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে তাঁর উপর। বয়কট করে তাকে ও সাহাবীদেরকে ক্ষুধায় কষ্ট দিয়েছে এবং হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবুও তাঁর কাজকে থামিয়ে দিতে পারেনি। তিনি নিজেও ধৈর্যহারা হননি। তাঁর সাথীদেরকেও ধৈর্যহারা হতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাকে আপন আশ্রয়ে নিয়ে নেন। তাই দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে কেউ অসৎ মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হলে এটা তার জন্য একটি বড় পুরস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এরা আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়ে যায়। কেননা দ্বীনের কাজে এবং সত্যের দিকে আহবান জানানোর প্রচেষ্টায় কোন লাঞ্ছনা নেই, বরং লাঞ্ছনা হলো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করায়, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, ব্যভিচার, হাইজ্যাক, ছিনতাই, রাহাজানি, কালোবাজারি, ওজনে কম দেয়া, প্রতারণা, চোগলখুরী, মিথ্যা ভাষণ এবং শিরক বিদআতসহ বিভিন্ন অসৎ কাজে।

এমনিভাবে যুগে যুগে আম্বিয়া,সাহাবা, মুজাদ্দিদ, ইমাম, ফকীহ, মুবাল্লিগ এবং সমাজসেবকগণ এই ধৈর্যের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে দেরী হলেও তারা প্রতীক্ষা পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা যদি প্রতীক্ষা করতে না চাইতেন বরং আজ বীজ বপন করে আগামীকালই যদি ফুল ও ফলের আশা করতেন তবে তাদের গতি মাঝপথেই থেমে যেত। কিন্তু তারা তা করেননি। বরং সীমাহীন ধৈর্য ও এক বুক আশা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। ফলে তাদের সাধনা দুনিয়াবাসীকে উপহার দিতে পেরেছে অনেক কল্যাণ, অনেক সাফলতা

দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং পরীক্ষা দেয়াই জীবন-মৃত্যু সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল (সূরা মুলুক, আয়াত:২)।

সবর মুমিনের জীবনের একটি অপরিহার্য গুণ। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, "ঘোষণা করে দাও, হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে" (সূরা জুমার, আয়াত-১০)।

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করবেন। আর ধৈর্য অপেক্ষা অধিক উত্তম ও কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দেয়া হয়নি' (বুখারি, ১৪৬৯)।

শূন্য থেকে অনন্যতায় উঠে যাওয়ার ইতিহাস যেমন পরীক্ষিত, তেমনি পুরনো। আর এর জন্য চাই নিশ্ছিদ্র ধৈর্য ও সাধনা। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় একবার যে বুক ভরে নিতে পেরেছে, বিজয় ও সফলতা তার পায়ে চুমু খেয়েছে বারবার। ধৈর্যশীলদের জন্য মহান আল্লাহ ভালোবাসা অনিবার্য।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন," নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৩)। পৃথিবীতে মানুষের জীবন বড়ই বিচিত্র। পাঁচতলায় থেকেও

কেউ যেমন দুঃখী হতে পারে। আবার কেউ গাছতলায় থেকেও সুখী হতে পারে। মানুষের জীবনে বহু রকমের দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। তবে মুমিনের জীবনে দুঃখ-কষ্ট তো অনিবার্য।

এই ঘোষণা আল্লাহ তায়ালা নিজেই কোরআনুল কারিমে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন,"আর আমরা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নিই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি" (সূরা মুযাম্মিলআয়াত:৩১)। এই দুঃখ-কষ্ট সব সময় মুমিনের জীবনে কল্যাণই বয়ে আনে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে আক্রান্ত করেন' (সহিহ বুখারি, হাদিস-৫৬৪৫)।

অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেন,আল্লাহ যখন কোনো মুমিন বান্দার আপনজনকে মৃত্যু দেয়, আর সে সবর করে, তখন আল্লাহর কাছে তার একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত (সহিহ বুখারি, হাদিস-৬৪২৪)।

আসলে পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট কার নেই? যদি আমাদের নবীজির জীবনীতে তাকাই; তিনি জগতের শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী। তা সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীরা তাকে মিথ্যুক বলে গালি দিয়েছে। তার মতো সুস্থ-নিখুঁত বুদ্ধি কার কখন ছিল? তথাপি তারা তাকে পাগল আখ্যায়িত করেছে। সর্বকালের সর্বোত্তম সারগর্ভ কথা তিনিই বলতেন। তারপরও তার অমূল্য কথাকে অসার কল্পনা ঠাওরানোর মতলবে তাঁকে কবি বলে কটাক্ষ করত। মানুষের শ্রেষ্ঠতম দরদি বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিত। তাঁর পবিত্র শরীরে আঘাতের পর আঘাত করেছে, তাঁকে রক্তাক্ত করেছে। তাকে দেশছাড়া পর্যন্ত করেছে। আমরা এর চেয়েও অনেক ভালো আছি।

সবরের এ ফজিলতের দিকে তাকিয়ে কেউ আবার বিপদ চেয়ে বসে কি-না- হাদিস শরিফে সে বিষয়ে আবার সতর্কও করা হয়েছে। বিপদ তো এক অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। সবরের সওয়াবের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। মানুষ মাত্রই

বিপদ থেকে দূরে থাকতে চায়। বিপদে পড়ে গেলে মুক্তি কামনা করে। এটাই স্বাভাবিক। ইসলামের শিক্ষাও তাই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- 'হে লোকসকল, তোমরা শত্রুর মুখে পড়ার কামনা কর না। বরং আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। তবে যখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে পড়বে তখন সবর কর'।

পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

"(সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেয়া হলো। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য"। (সূরা আহকাফ,আয়াত:৩৫)।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন : "হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"। (সূরা আলে ইমরান,আয়াত:২০০)।

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন : "হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন"। (সূরা বাকারা, আয়াত:১৫৩)।

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন : "যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর"। (সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭)।
আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন : "তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব"। (সূরা নাহল,আয়াত : ৯৬)।

আরো ইরশাদ হয়েছে "এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয়করে"।(সূরা কাসাস,আয়াত:৫৪)। তিনি আরো বলেন : "আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে যখন তারা সবর অবলম্বন করল এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত"। (সূরা সাজদা, আয়াত:২৪)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবর ও ধৈর্যের বিষয়টি কতো তাৎপর্যপূর্ণ ও কতো অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর ও ধৈর্য। তাই তো রাসূলে কারীম (সা.) সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন।তিনি বলেছেন 'সবর ও ধৈর্য হলো আলো'। (মুসনাদে আহমাদ : ২২৯০২)।
অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যূতিময়। তাই জীবনকে রাঙ্গাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে

আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যাবতীয় অর্থেই সবরকারী ও ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন।

ধৈর্য বা সবরের পুরস্কার :

মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে। সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সে তা হালকা ভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখে। কারণ, সে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে তকদীরকে বিশ্বাস করে। তাকদীরকে বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি রোকনের একটি।

তাকদীরের উপর ঈমান রাখলে তার অনেক সুফল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হল, বিপদে ধৈর্য ধারণ। সুতরাং কোন ব্যক্তি বিপদে সবর না করলে তার অর্থ হল, তার কাছে ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিটি অনুপস্থিত। অথবা থাকলেও তা খুব নড়বড়ে। ফলে সে বিপদ মুহূর্তে রাগে-ক্ষোভে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, এটা এমন এক কুফুরী মূলক কাজ যা আকীদার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে।

বিপদে পড়লে যদি গুনাহ মোচন হয়, পাপরাশী ঝরে যায় তবে এটা তো বিশাল এক নেয়ামত। সাধারণভাবে বালা-মসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম। বিপদ-মুসীবত যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে তবে এই মুসীবত তার জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে পরিণত হয়।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে নবী-রাসুলদের বিপদগ্রস্ত হওয়ার এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যেন পরবর্তী সময় মুমিনরা বিপদে আল্লাহর ওপর আস্থা রাখে। তাঁর সাহায্যের জন্য দোয়া প্রার্থনা করে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। আল্লাহ যেমনটি অঙ্গীকার করেছেন। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

“‘আল্লাহ অচিরেই কাঠিন্যের পর সহজতা দান করবেন।”(সুরা আত-তালাক,আয়াত : ৭)

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যখন কোনো মুমিন বিপদগ্রস্ত হয় আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপ মোচন করেন, যদি না সে অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়ায়।’ (সহিহ বোখারি, হাদিস : ৫৬৪০)

আলোচ্য হাদিসে মুমিন বান্দাদের বিপদগ্রস্ত হলে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো মুমিন বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর মানুষের কাছে অভিযোগ-অনুযোগ এবং ভাগ্যকে দোষারোপ না করে ধৈর্যধারণ করলে বিনিময়ে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন। এ ছাড়া ধৈর্যধারণের আরো অনেক পুরস্কারের ঘোষণা কোরআন ও হাদিসে এসেছে। নিম্নে কোরআনে বর্ণিত আটটি আসমানি পুরস্কারের বর্ণনা দেওয়া হলো :

এক. আল্লাহকে কাছে পাওয়া যায় : ধৈর্যধারণকারীর সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। ইরশাদ হয়েছে, “নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে আছেন।” (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৫৩)

দুই. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, “এবং আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীকে ভালোবাসেন।” (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৬)

তিন. ধৈর্যধারণকারীর জন্য অপেক্ষা করে সুসংবাদ : যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, “এবং আপনি ধৈর্যধারণকারীদের সুসংবাদ দিন।” (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৫)

চার. ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম প্রতিদান : আল্লাহ ধৈর্যের পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছেন,”যারা ধৈর্যধারণ করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে তারা যে কাজ করে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেব।”(সুরা : নাহল,আয়াত : ৯৬)

পাঁচ. ধৈর্যশীলদের আল্লাহ সাহায্য করেন : পবিত্র কোরআনে ধৈর্যশীলদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, “হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক

পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।"(সুরা আলে ইমরান,আয়াত: ১২৫)

ছয়. ধৈর্যশীলদের প্রতি ফেরেশতাদের সালাম : ধৈর্যশীল বান্দা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, জান্নাতের ফেরেশতারা তাদের প্রতি সালাম পাঠ করবে। আল্লাহ বলেন, "এবং ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হবে এবং বলবে তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কতই না ভালো পরিণাম।" (সুরা ইনসান, আয়াত : ১২)

সাত. আল্লাহ তাদের রক্ষক হয়ে যান : আল্লাহ নিজেই ধৈর্যশীলদের রক্ষা করেন। ইরশাদ হয়েছে, "যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো তবে তাদের কোনো কৌশল তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১২০)

আট. নেতৃত্ব লাভ : শায়খ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্জিত হয়। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, "আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাসী।" (সুরা : সিজদা,আয়াত :২৪)

নয়. পরিশুদ্ধ করা : পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ উত্তমকে মন্দ থেকে পৃথক করে নেন। ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায় আল্লাহ কোনোক্রমেই বিশ্বাসীদের ফেলে রাখবেন না, যে পর্যন্ত না তিনি ভালোদের থেকে মন্দদের পৃথক করেন।" আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তার প্রিয় বান্দাদের আলাদা করে নেন। তিনি যাচাই করেন কারা সবরকারী এবং শুকরিয়া আদায়কারী এবং কারা অকৃতজ্ঞ।

দশ. মর্যাদা বৃদ্ধি :

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে মুমিন বান্দার নেকি অর্জিত হয় এবং মহান আল্লাহ তাকে এমন মর্যাদা দান করেন, যা সে আমলের মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম ছিল না।

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এমন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, যা সে তার আমলের মাধ্যমে লাভ করতে সক্ষম ছিল না। তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ অথবা তার সন্তানকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে সেই বিপদে ধৈর্য ধারণের সক্ষমতা দান করেন। অবশেষে তাকে সেই মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল।’ (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ২২৩৩৮; আবু দাউদ, হাদিস : ৩০৯০)

নবী-রাসুলদের ধৈর্যের পরীক্ষা:

সব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকা নবী-রাসুল ও মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।যুগে যুগে মানুষকে সুপথ প্রদর্শনকারী নবী- রাসুলগনও কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন।এবং সেইসব কঠিন বিপদের মুহূর্তে তারা সবরের সুউচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নিম্নে কঠিন সময়ে কয়েকজন নবী ও রাসুলের ধৈর্যের পরীক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান : প্রায় হাজার বছর ধরে নুহ (আ.) মানুষকে আল্লাহর নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। কিন্তু খুবই সামান্য সংখ্যক মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দেয়। তবুও তিনি নিজ সম্প্রদায়ের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও নির্যাতনের মধ্যে আল্লাহর পথে আহবান অব্যাহত রাখেন।ইরশাদ হয়েছে, “আমি তো নুহ (আ.) কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম,তিনি তাদের মধ্যে ৫০ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেন,অতঃপর তাদের প্লাবন গ্রাস করে।কেননা তারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। অতঃপর আমি তাকে নৌকাবাসীদেরকে রক্ষা করেছি এবং বিশ্ববাসীর জন্য তাকে নিদর্শন করেছি।”(সুরা আনকাবুত, আয়াত: ১৪-১৫)

২. ধৈর্যশীলদের প্রতীক যিনি : আইয়ুব (আ.) নবী ও রাসুলদের মধ্যে ধৈর্যশীল হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত। পবিত্র কোরআনে তাঁর এ গুণের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ

দীর্ঘ ১৮ বছর শারীরিক ও আর্থিক নানা সমস্যায় ভুগেও মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবকে, তিনি তাঁর রবকে ডেকে বলেন, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আপনি পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করুন, এতে গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয় রয়েছে। আমার অনুগ্রহে আমি তাকে তার পরিবার দান করেছি এবং তাদের মতো আরো, তা বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আপনি এক মুষ্ঠি তৃণ নিয়ে আঘাত করুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না, আমি তাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পেয়েছি, কতই না উত্তম ছিলেন তিনি, তিনি ছিলেন আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা সাদ, আয়াত : ৪১-৪৪)

৩. যিনি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু : শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারে অবিচল ছিলেন। নিজ পরিবার থেকে শুরু করে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি তাওহিদের কথা বলে যান। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। এত কিছুর পরও তিনি স্থির ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাবান ছিলেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশে সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে যায়। জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি হাজেরা (আ.) ও পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে মক্কার জনশূন্য প্রান্তরে রেখে আসেন। এমনকি তার প্রিয় পুত্রকে কোরবানি করতে বলা হয়। এসব পরীক্ষায় তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন এবং খাঁটি বন্ধুর স্বীকৃতি লাভ করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'দ্বিনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে আর কে উত্তম যে সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণ করে, আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১২৫)

৪. দীর্ঘ অপেক্ষার পর সন্তানের সন্ধান : ইয়াকুব (আ.) প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তখন তিনি ধৈর্যকে নিজের একমাত্র সম্বল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রাখেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে আনে, তিনি (ইয়াকুব আ.) বলেছিলেন, না, তোমরা এই ঘটনা সাজিয়েছ, অতএব পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম, তোমরা যা বলছ এই

ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১৮)। অতঃপর ইয়াকুব (আ.) দ্বিতীয় সন্তানকে হারান। তিনি নিজের সব দুঃখ-ব্যাথাকে আল্লাহর কাছে অর্পণ করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি বললেন, আফসোস ইউসুফের জন্য, শোকে তার দুই চোখ সাদা হয়ে পড়ে, তিনি খুবই কষ্টে ছিলেন।...তিনি বলেন, আমি আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহর কাছে আবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তুমি জানো না। হে আমার সন্তানরা, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে অনুসন্ধান কোরো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হইয়ো না। কেননা অবিশ্বাসী ছাড়া কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় না।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৬-৮৭)

৫. মাছের উদোরে আল্লাহকে স্মরণ : ইউনুস (আ.) দীর্ঘ সময় মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের কথা বলেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ তার মানেনি। নিরাশ হয়ে তিনি তাদের ছেড়ে চলে যান। অতঃপর নানা ঘটনার পর তাঁর আশ্রয় হয় একটি মাছ উদরে। সেখানে তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত অতবাহিত করেন। এ সময় তিনি শুধু আল্লাহর কাছে অনুনয় করে দোয়া করতেন। ইরশাদ হয়েছে, ইউনুস ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করুন, তিনি পালিয়ে একটি ভর্তি নৌকায় যান। অতঃপর লটারিতে অংশ পরাজিত হন। তাকে একটি বড় মাছ গিলে ফেলে তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর তাসবিহ না পড়লে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের উদরে থাকতেন।' (সুরা সাফফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৪)। পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.)-কে তার কথা উল্লেখ করে তার মতো ধৈর্যহারা হতে বারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'অতএব আপনি আপনার রবের নির্দেশে ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি মাছাওয়ালার মতো হবেন না, যখন তিনি দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিলেন। তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছলে তিনি লাঞ্ছিত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন।' (সুরা কলম, আয়াত : ৪৮)।

মহানবী (স:) এর ধৈর্যশীলতা :

মহানবী (সা.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। তিনি পৃথিবীতে আগমনের আগে তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে অনাথত্বের দুঃখগুকষ্টের ওপর তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। মাত্র ৬ বছর বয়স হওয়ার পর মা আমিনা এ ধরাধাম হতে চিরবিদায় নেন। ফলে মায়ের আদর হতে বঞ্চিত অবস্থায় অসহায়ভাবে ধৈর্যধারণ করে জীবনযাপন করতে হয়। আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিব পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। দাদার আদর হতে বঞ্চিত হয়েও তিনি ধৈর্যধারণ করেন। এরপর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে দুঃখগুকষ্টে তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর ৪০ বছর বয়সে যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হন, তখন দ্বীন ইসলামের প্রচারে নানা বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। সব বাঁধা উপেক্ষা করে তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। কোরাইশের লোকরা তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে থাকে ও নানা বিদ্রুপবাণে জর্জরিত করতে থাকে। মহানবী (সা.) এসব কিছুর ওপর ধৈর্যধারণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। লোকেরা আশানুরূপভাবে ঈমান না আনার কারণে তিনি পরিতাপ করতে থাকেন। লোকদের ঈমান না আনার বিষয়টি তাকে কষ্ট দিতে থাকে। তিনি পরিতাপ ও আফসোস করার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যদি তারা এ বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পেছনে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ শেষ করে ফেলবেন।’ (সুরা কাহফ,আয়াত : ৬)।

নামাজে বাঁধা ও নবীজির সবর:

মহানবী (সা.)-এর জন্য দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কোরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজের পরিবার-পরিজন ও গোত্রসহ আবু তালিবের ঘাঁটিতে ৩ বছরের বন্দি জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তিনি থেমে যাননি। সর্বাবস্থায় দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন; আপন লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার রাসুল (সা.) সেজদারত ছিলেন। তার আশপাশে কোরাইশের মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইবনে আবু মুআইত উটের ভুঁড়ি এনে মহানবী (সা.)-এর পিঠে ফেলে দিল। ফলে তিনি তার মাথা তুলতে পারলেন না। অবশেষে ফাতেমা (রা.) এসে তার পিঠ হতে তা সরিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে, তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। এরপর রাসুল (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহ! কোরাইশদের এ দলের বিচার আপনার ওপর ন্যাস্ত করলাম। হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহেল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবিআ, শাইবা ইবনে রবিআ, উকবা ইবনে আবু মুআইত ও উমাইয়া ইবনে খালফকে শাস্তি দিন।' ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া তাদের সবাইকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। কেননা, সে ছিল মোটা দেহের। যখন তার লাশ টানা হচ্ছিল, তখন কূপে নিক্ষেপ করার আগেই তার জোড়াগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' (বোখারি : ৩১৮৫)।

কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির ধৈর্য:

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথে কোরাইশের লোকেরা মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর ও পাশবিক আচরণ করত। কিন্তু রাসুল (সা.) এ ধরার বুকে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষে সব কষ্ট সহ্য করে নিতেন। অম্লান বদনে সহ্য করতেন কাফের বে-দ্বীনের অন্যায়-অত্যাচার। উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন আচরণ কী করেছিল? তিনি বললেন, আমি উকবা ইবনে আবু মুআইতকে দেখেছি, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এলো, যখন তিনি নামাজ আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসুল (সা.)-এর গলায় জড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। আবু বকর (রা.) এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি এমন লোককে মেরে ফেলতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার প্রতিপালক! যিনি তার দাবির স্বপক্ষে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?' (বোখারি : ৩৬৭৮)।

বিপদাপদে ও অনাহারে সবর:

পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল এসেছেন, সবাইকেই বিভিন্ন বালা-মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ, যুগে যুগে একত্ববাদের অনুসারী খুব কম লোকই হয়েছে। হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় সব সময় সত্য ও মিথ্যার লড়াই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হকের বিরোধী লোক বেশি থাকার কারণে সত্যের ধারক-বাহকদের ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিশ্বনবী (সা.)-ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাকেও দ্বীনের পথে বহু কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। করতে হয়েছে ধৈর্যধারণ। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোন মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়?' তিনি

বললেন, 'নবীদের। এরপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের। বান্দাকে তার দ্বীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দ্বীনদারিতে অবিচল থাকে, তবে তার পরীক্ষাও হয় কঠিন। আর যদি সে তার দ্বীনদারিতে নমনীয় হয়, তবে তার পরীক্ষাও সে অনুযায়ী হয়। এরপর বান্দা অহরহ বিপদাপদে পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গোনাহমুক্ত হয়ে পবিত্র অবস্থায় বিচরণ করে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২৩)। রাসুল (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ফলে তার পরীক্ষা হয়েছিল কঠিন থেকে কঠিনতর। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে আল্লাহর পথে যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে সেভাবে দেখানো হয়নি। আমাকে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশে যেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে, আর কোনো ব্যক্তিকে সেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়নি। আমার ওপর দিয়ে ত্রিশটি দিনরাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বেলালের সম্বল। তা ছাড়া এতটুকু আহারও ছিল না, যা কোনো প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।' (তিরমিজি : ২৪৭২)।

পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ:

মহানবী (সা.) তার আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছেন। খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তিনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও কাতর হয়ে পড়েন। তিনি এতটাই ভারাক্রান্ত হন যে, তার মৃত্যুর বছরকে 'শোকের বছর' বলে নামকরণ করেন। যয়নাব (রা.)-এর এক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে মহানবী (সা.) হা-হুতাশ না করে ধৈর্যধারণ করেন ও নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন। ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জনৈক কন্যা (যয়নাব) নবী (সা.)-এর কাছে এ বলে লোক পাঠালেন, 'আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের কাছে আসুন।' তিনি বলে পাঠালেন, '(তাকে) সালাম দেবে ও বলবে, আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি নিয়ে যান। আর তাঁরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু

তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যের অপেক্ষায় থাকে।' তখন তিনি তার কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে সাদ ইবনে উবাদা, মুআজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি ছিলেন। তখন শিশুটিকে রাসুল (সা.)-এর কাছে তুলে দেয়া হলো। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার নিঃশ্বাসে মশকের মতো শব্দ হচ্ছিল! আর নবীজি (সা.)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সাদ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এ কি?' তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।' (বোখারি : ১২৮৪)।

মহানবী (সা.)-এর ঔরসজাত সন্তান ইবরাহিম (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তখনও তিনি কান্নাকটি ও বিলাপ না করে ধৈর্যধারণ করেন। অবশ্য দয়া ও করুণার অশ্রু তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট।' আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন নবী-তনয় ইবরাহিম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় বাবা। রাসুল (সা.) ইবরাহিম (রা.)-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আরেকবার) আমরা তার (আবু সায়ফের) বাড়ি গেলাম। তখন ইবরাহিম (রা.) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে রাসুল (সা.)-এর উভয় চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও কাঁদছেন?' রাসুল (সা.) বললেন, 'অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি, যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।' (সহীহ বুখারি : ১৩০৩)।

ধৈর্য ধারনের উপায়:

ধৈর্য সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা পৈতৃকসূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায় তাহলে কেবল তার জন্যই ধৈর্যধারন করা সম্ভব। কারণ ধৈর্য এমন ফুল, যা সব জায়গায় সুবাস ছড়ায়। আল্লাহ তাআলা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"(সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৬)

যেভাবে ধৈর্যের চর্চা করব:

এক. এ কথা বিশ্বাস করা যে সব কিছুর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। তাঁর কোনো কাজের ওপর প্রশ্ন করার কারো কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, বরং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

দুই. সব বিষয় আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমার কখন কোন মুসিবত আসবে তা আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। অসুস্থতা, দারিদ্র্য, দুঃখ-বেদনা যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছু আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে, এ ধারণা একজন মুমিন সর্বদাই পোষণ করে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'যদি সব উম্মত তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অন্যদিকে যদি সব উম্মত তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে,

যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৬)

তিন. এ কথা বিশ্বাস করা, পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে কেউ-ই আপদমুক্ত নয়। ছোট-বড় বিপদাপদে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। এ দুনিয়া বিপদের জায়গা। তাই এমন ধারণা পোষণ করা যে আমার কোনো ধরনের বিপদাপদ আসবে না, তা চরম ভুল, বরং এর মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো পরীক্ষার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, আবার গুনাহ মাফ করার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, বান্দাকে আরো আল্লাহর নৈকট্য করে তোলার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "মানুষ কি মনে করেছে যে আমরা ঈমান এনেছি—এ কথা বললে তাদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?" (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ২-৩)

চার. বান্দা যেন বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, সে জন্য আল্লাহ বান্দাকে ছোট-বড় বিপদ দিয়ে থাকেন; এই বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৬)

পাঁচ. বান্দার জানা নেই তার জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। তাই কখনো কখনো বিপদ তার জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, "তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ যা জানেন তোমরা তা জানো না।" (সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৬)

ছয়. এ কথা চিন্তা করা যে দুনিয়া কারো স্থায়ী জায়গা নয়, বরং এটি একটি স্টেশনের মতো। তাই ছোট ছোট মসিবতের ওপর যদি ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর জন্য অনেক বড় বিনিময় দান করবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাততুল্য।' (মুসলিম, হাদিস : ৭৩০৭)

সাত. বিপদাপদে এ কথা মনে করা যে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসুল ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। আমাকেও পরীক্ষা করে আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই বিপদের সঙ্গে মুক্তি আছে, কষ্টের সঙ্গে আছে স্বস্তি। এ ছাড়া একজন মুমিনের এ কথা বিশ্বাস রাখা চাই যে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এমন কোনো মসিবত দেন না, যা তার সক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যাতীত।" (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

আট.কোনো মানুষ যদি কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য সুন্দর ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করা। যেমন—কোনো ব্যক্তি আপনাকে রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করেছে। আপনি মনে মনে ভাবলেন, লোকটা মনে হয় এমনিতেই রাগী। তাই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেছে। তার স্বভাব এটা। সুন্দরভাবে কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারা, এটা এক ধরনের তার অসুস্থতা।

নয়.যে কোনো বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ ও স্বলাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহই মুমিনের চূড়ান্ত ভরসাস্থল। কুরআনে আল্লাহ তার সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।" (সুরা বাকারা,আয়াত: ৪৫)। নবিজির (সা.) এর অভ্যাস ছিল যে কোনো বিপদের সময় নামাজে দাঁড়ানো। তার সাহাবি হোজাইফা (রা.) বলেন, 'নবি (সা.) কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন।' (সুনান আবু দাউদ: ১৩১৯)

দশ. ধৈর্য চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দোয়া করতে হবে। আল্লাহই সকল বিষয়ের তাওফিক দাতা, সঠিক পথে পরিচালনাকারী, দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ তাঁর হাতেই। আত্মা বিনষ্টকারী যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য তিনিই একমাত্র উত্তম সাহায্যকারী। তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (সুরা গাফের : আয়াত ৬০)।

সবর লাভের দোয়া:

উচ্চারণ : ‘রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া তাওয়াফফানা মুসলিমিন।’
অর্থ :হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে সবর দান করো, এবং আত্মসমর্পণকারী মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করো।

আরেকটি সুন্দর দোয়া:

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা ইনদাকা আহতাসাবতু মুসিবাতি ফা-জুরনি ফিহা ওয়া আবদিলনি মিনহা খইরা।
অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তাআলার এবং আমাদের অবশ্যই তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি আমার বিপদের প্রতিদান চাই। অতএব, তুমি আমাকে এর প্রতিদান দাও এবং এর বিনিময়ে ভালো কিছু দান করো।
রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কারো ওপর কোনো বিপদ এলে অবশ্যই এই দোয়া পড়বে। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫১১)

রাগ নিয়ন্ত্রণ :

অনেকের অল্পতে রেগে যাওয়ার প্রবণতা আছে, যাকে বলে খিটখিটে মেজাজ। মেজাজের ওপর কম নিয়ন্ত্রণ থাকলে এমনটি হয়। অনিয়ন্ত্রিত রাগ হওয়া মানবীয় ত্রুটি। ইসলাম মানুষকেই এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার উৎসাহ দিয়েছে। যারা কঠিন রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, মহান আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, “এবং রাগ দমনকারীরা ও মানুষকে ক্ষমাকারীগণ, আল্লাহ অনুগ্রহকারীকে ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৪)। রাগের বশবর্তী হয়ে কারো ক্ষতি করে ফেলা বিরত্ব নয়; বরং বিরত্ব হলো, কঠিন রাগের সময় নিজেকে

নিয়ন্ত্রণ করতে পারা। রাসুল (সা.) বলেন, 'সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে ব্যক্তি কুস্তি লড়ে অন্যকে ধরাশায়ী করে, বরং প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই শক্তিশালী, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।'(বুখারি, হাদিস : ৬৮০৯)। এ কারণে রাসুল (সা.) তাঁর প্রিয় উম্মতদের রাগ করতে নিষেধ করেছেন।

রাগ দমনের কিছু পদ্ধতিও ইসলামী শরিয়তে বর্ণিত হয়েছে। যেমন—রাগ মূলত দুটি কারণে হতে পারে, এক. শারীরিক অসুস্থতা, অনিদ্রা, রক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার কারণে হতে পারে। এর থেকে বাঁচতে পুষ্টিকর খাবার ও পর্যাপ্ত ঘুমের বিকল্প নেই। বিশেষ করে অহেতুক রাতজাগা বন্ধ করা এর কার্যকরি ওষুধ। প্রিয় নবী (সা.) অহেতুক রাতজাগা পছন্দ করতেন না। বারজাহ (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) এশার আগে ঘুমানো এবং এশার পর না ঘুমিয়ে গল্পগুজব করা অপছন্দ করতেন।' (বুখারি, হাদিস : ৫৬৮)

কখনো কখনো মানসিক কারণেও মানুষের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। এ পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য নিম্নের আমলগুলো করা যেতে পারে।

রাগ নিয়ন্ত্রণের ইসলামিক পদ্ধতি :

১.আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা : দুই ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে বসে পরস্পর গালাগাল করছিল। তাদের একজনের চোখ লাল হয়ে উঠল ও গলার শিরা ফুলে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে তবে তার এ অবস্থা কেটে যাবে। সে বাক্যটি হলো, আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (মুসলিম, হাদিস : ৬৮১২)

২.চুপ থাকা : অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা না করে চুপ হয়ে যাওয়া। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। কঠিন কোরো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো;

যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৪৭৮৬)

৩.শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন : রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো রাগ হয় তখন সে যদি দাঁড়ানো থাকে, তবে যেন বসে পড়ে। যদি তাতে রাগ চলে যায় ভালো। আর যদি না যায়, তবে শুয়ে পড়বে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৮৪)

৪.অজু করা : রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তান আগুনের তৈরি। নিশ্চয়ই পানির দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয় সে যেন অজু করে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৮৬)

৫.অধিক হারে আল্লাহর জিকির করা :

যেমন কুরআন পাঠ, তাসবীহ, তাহলীল পাঠ, ইস্তিগফার ইত্যাদি করা। কেননা মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র তাঁর জিকিরই অন্তরে প্রশান্তি আনতে পারে। তিনি বলেন, "জেনে রাখ আল্লাহ্র জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" [সূরা রা'দঃ ২৮]।

৬.সঠিকভাবে দেহের হক আদায় করা :

প্রয়োজনীয় ঘুম ও বিশ্রাম গ্রহণ করা, সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ না করা, অযথা উত্তেজিত না হওয়া। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের ক্রোধের কারণ খুঁজতে গিয়ে অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই এ কারণগুলো পাওয়া গেছে -অধিক পরিশ্রমের কাজ করা, ক্লান্তি, অনিদ্রা, ক্ষুধা ইত্যাদি। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি শুনেছি যে, তুমি দিনের বেলা রোজা রাখ এবং রাতের বেলা নফল নামাজ আদায় কর-এটা কি ঠিক? আমি বললাম, হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনেছেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এরূপ করো না। বরং মাঝে মাঝে রোজা রাখবে এবং মাঝে মাঝে রোজা ছাড়বে এবং রাতের কিছু অংশে নামাজ পড়বে এবং কিছু অংশে বিশ্রাম নেবে। কারণ-তোমার উপরে তোমার শরীরের হক রয়েছে,তোমার চোখের হক রয়েছে,তোমার উপরে তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে,তোমার জন্য প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখাই যথেষ্ট। এতে সারা বছর রোজা

রাখার সওয়াব রয়েছে। কেননা প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি আমার নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো একাধারে রোজা রাখতে এবং রাতের বেলা নামাজ পড়তে সক্ষম। আব্দুল্লাহ বিন আমর বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে বললেন, হায় আফসোস! আমি যদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ মেনে নিতাম, তাহলে কতইনা ভাল হতো। (মুসলিম)

৬. রাগের যাবতীয় কারণ থেকে দূরে থাকা :

রেগে যাওয়া মানেই হেরে যাওয়া। রাগ করে কেউ বড় কিংবা সুখী হতে পারেনি। ছোটখাটো যে বিষয়গুল নিয়ে রাগ করা হয়, সে বিষয়গুলো সহজ করে নিলেই তা সহজে মীমাংসা হয়ে যায়। কেউ কারো সাথে রাগান্বিত হলে তখন অবশ্যই দূরে দূরে অবস্থান করা উচিত। ফলে ধীরে ধীরে রাগ কমে যাবে এবং অতিরিক্ত ঝগড়া হবে না।

৭.পুরস্কার এবং প্রতিদানের আশা রাখা:

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে বলেন- "তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে চলো, যার পরিধি হলো আসমান ও জমিন সমান, যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর সৎকর্মশীলদের আল্লাহ ভালবাসেন।" [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৪]

রাগ নিয়ন্ত্রণ করলে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-'যে তার জিহ্বাকে হেফাজত করবে, আল্লাহ আল্লাহ তার গোপনীয়তা ঢেকে রাখবেন। যে তার রাগ-ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।'[ইমাম বাইহাকি, শু'আবুল ঈমান: ৭৮১৮; শায়খ আলবানি, সিলসিলা সহিহাহ: ২৩৬০; হাদিসটির সনদ হাসান]

যে কোনো হুর বাছাইয়ের সুযোগ:

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

‘যে ব্যক্তি নিজের রাগ/ক্রোধকে কার্যে পরিনত করার ক্ষমতা রেখেও তা সংবরণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং জান্নাতের যে কোনো হুর বেছে নেওয়ার অধিকার দেবেন।’[ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান: ৪৭৭৭; ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ৪১৮৬; হাদিসটি সহিহ]

বিরাট প্রতিদানের ঘোষণা:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-‘আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ/রাগ সংবরণে যে বিরাট প্রতিদান রয়েছে, তা অন্য কিছু সংবরণে নেই।’’ [ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ৪১৮৯; হাদিসটি সহিহ]

৮. ধৈর্যশীলদের সংশ্রবে থাকার চেষ্টা করা: ধৈর্যশীল বান্দাদের সংশ্রবে থাকলে ধীরে ধীরে রাগ কমে যাবে এবং ধৈর্য নামক গুনটি চলে আসবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ধৈর্যশীল বান্দা হওয়ার তাওফিক দান করুন।

জান্নাতি সুখানুভূতি:

একজন বিশ্বাসী মুসলিম বিপদে আপদে, বালা মুসিবতে সর্বাবস্থাতেই জান্নাতি সুখ অনুভব করেন। কারন সে তাকদীরে বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতিটি সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে।

যখন তাকে কেউ অপদস্ত করতে চায়,তখন সে এটা ভেবে প্রফুল্ল থাকে যে,আল্লাহ কুরআনে বলেছেন-

"সম্মান তে আল্লাহ তায়ালা,তার রাসুল এবং মুমিনদের জন্যই,কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না"।(সুরা মুনাফিকুন, আয়াত:৮)

যখন সে বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন এ আয়াত স্মরণ করে স্বস্তি লাভ করে-

"আল্লাহ তায়ালা কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" (সুরা যুমার,আয়াত:৩৬)

যখন কেউ তাকে বুঝতে চায় না,তার সমস্যাগুলো শুনতে চায় না,তখন সে এটা ভেবে প্রশান্ত থাকে যে-

"আমি তো আমার দুঃখ এবং অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি।" (সুরা ইউসুফ,আয়াত:৮৬)

যখন কোন দুর্দশা তার দরজায় কড়া নাড়ে,তখন সে এটা ভেবে আনন্দ অনুভব করে যে-

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।" (সুরা আশ-শারহ,আয়াত:৫)

এভাবে মুসলিমরা যে কোন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারনের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয়। খুঁজে পায় পরিতুষ্টির বিভিন্ন রুপ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এরুপ মানসিকতা না থাকলে কষ্ট, দুর্দশা গুলো অসহনীয় রুপ ধারন করে। জীবন যেন হয়ে ওঠে সেই লবনাক্ত পানি গ্রহনকারী ব্যক্তির মতো,যার তৃষ্ণা কখনোই নিবারন করা যায় না। এ ধরনের মানুষগুলো দীর্ঘমেয়াদী শান্তির খোঁজে বেপরোয়াভাবে নিজেকে পাপের এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায়, এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায়, এক পানীয় থেকে অন্য পানীয়তে,এক সম্পর্ক থেকে অন্য সম্পর্কে, একটা অশ্লীল ভিডিও থেকে অন্যটিতে আবর্তিত হয়।

কিন্তু আল্লাহর সাথে সৃষ্ট দুরত্ব তার অন্তরকে ধীরে ধীরে কঠিন থেকে কঠিনতর করে। জীবনকে করে তোলে অন্ধকারচ্ছন্ন। তখন সে তার অন্তরের শুন্যতা পূরণ করতে চায়। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহমাতুল্লাহ বলেন-প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরেই কিছু অস্থিরতা বিদ্যমান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই নির্মুল করা সম্ভব।

হারাম পন্থায় অন্তরের শুন্যতা পূরন কখনোই সম্ভব নয়। বরং সেটা কেবল শুন্যতাকে বিস্তৃতই করে। মনের প্রশান্তি কেবলমাত্র আল্লাহর নৈকট্য এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

আমরা সুখী, কারন আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, তাকে আমাদের রব হিসেবে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট। আমরা সুখী, করন আমাদের মানুষের তৈরি জীবনবিধানের উপর নির্ভরশীল করা হয়নি, বরং কুরআনই আমাদের জীবন বিধান। আমরা সুখী, কারন কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাদেরই হিসাব নেয়া হবে এবং আমাদেরকেই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আমরা সুখী,কারন আমাদের রয়েছে ইসলাম প্রদত্ত সেই আত্মিক প্রশান্তি, যা সম্পর্কে রসুল (সঃ) বলেছেন -

'মুমিনের বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর! তার সব কিছুই কল্যানকর ;মুমিন ছাড়া অন্য কারোর জন্যই সেটি প্রজোয্য নয়। তার জীবনে সুখ- সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা হয় তার জন্য কল্যানকর। আর দুঃখ- দুর্দশার মুখোমুখি হলে ধৈর্যধারন করে, ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যানকর।'

সমাপ্ত